রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী
সেই সময় এই সময়

মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

সুবর্ণরেখা
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এক অন্তর্দ্রষ্টা ও সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষ। একাধারে তিনি কবি ও সুরকার, অন্যদিকে শিল্পী, শিক্ষাবিদ ও মানবপ্রেমী। শিক্ষার লক্ষ্য এবং আদর্শ সম্বন্ধে তাঁর ছিল গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং সুদূরপ্রসারী চিন্তাভাবনা যা তাঁর রচিত গান, নাটক, কবিতা এবং নানা শিল্প-সাহিত্যের মধ্যে বিধৃত। এখনও তা সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিক বর্তমান পরিবর্তনশীল আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে। ভারতবর্ষের তপোবন শিক্ষার মূল মন্ত্রটি রবীন্দ্রনাথ আত্মস্থ করেছিলেন মর্মে মর্মে ছোটোবেলা থেকেই। অনুভব করতে পেরেছিলেন অন্তরের গভীরতম স্থান থেকে। তাই প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে কীভাবে একটি শিশুকে সর্বাঙ্গীণভাবে গড়ে তোলা যায় — তারই প্রচেষ্টায় গড়ে তুললেন শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম বা ব্রহ্মবিদ্যালয় (১৯০১ সালের ২২ ডিসেম্বর, বাংলা ৭ই পৌষ ১৩০৮) কখনও পূর্ব বিভাগ এবং শেষে বর্তমান পাঠভবন (১৯২৪)। পরবর্তীকালে প্রায় আড়াই দশক পরে প্রতিষ্ঠা করলেন শিক্ষাসত্র স্কুল (১৯২৪)। তারও দু'বছর আগে প্রতিষ্ঠা করলেন শ্রীনিকেতন (১৯২২), গ্রামের মানুষের সেবার উদ্দেশ্য নিয়ে। এর আগেই ১৯২১ সালে ভারতের সঙ্গে বিশ্বের সমগ্র সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধন হিসাবে গড়ে তুলেছিলেন, বিশ্বভারতী। এর তিনবছর আগেই ১৯১৮ সালে সূচনা হয় এই বিশ্বভারতীর। বললেন — "বিশ্বভারতীতে ভারতের নিমন্ত্রণবাণী বিশ্বের কাছে ঘোষিত হোক। বিশ্বভারতীতে ভারত আপনার সেই সম্পদকে উপলব্ধি করুক, যে সম্পদকে সর্বজনের কাছে দান করার দ্বারাই লাভ করা যায়" — 'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্' — এই মন্ত্রের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে বিশ্বভারতীর আদর্শের মূল বীজমন্ত্রটি।"

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম বা ব্রহ্মবিদ্যালয় গড়ে তোলার পেছনে ছিল রবীন্দ্রনাথের 'বিদ্যালয়' জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা। অপরদিকে বিশ্বভারতী গড়ে তোলার পেছনে ছিল ভারতের একের ভেতরে বহুর 'চিত্তকে' সম্মিলিত করা ও তার চিত্ত-সম্পদকে সংগৃহীত করার প্রচেষ্টা। রবীন্দ্রনাথের এই বিদ্যালয় গ'ড়ে তোলার পেছনে যে আকাঙ্ক্ষা ও প্রবল ইচ্ছা ছিল তা তাঁর অসংখ্য লেখা, প্রবন্ধ, রচনা এমনকি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় মুদ্রিত ও সংকলিত হয়ে আছে স্পষ্টভাবে। তার মধ্যে প্রধান — 'শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম —প্রতিষ্ঠা দিবসের উপদেশ ও প্রথম কার্যপ্রণালী', 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' ও 'বিশ্বভারতী' পুস্তকসমূহ। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ১৩৪৭ সাল (১৯৪১) পর্যন্ত কুড়ি বৎসরের বেশি শান্তিনিকেতন আশ্রমবিদ্যালয় ও বিশ্বভারতীর আদর্শ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন — বিশেষভাবে মন্দিরের উপাসনায় যে সব ভাষণ উপস্থাপন করেছিলেন

তার মধ্যেই ছড়িয়ে আছে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনার নানা মানিমুক্তো। তাছাড়া 'শিক্ষা' গ্রন্থে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-চিন্তা সম্পর্কে আরও গভীর বাণী ও ভাবনার প্রতিফলন। 'জীবনস্মৃতি'র অনেকটা জুড়ে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের শৈশব জীবনের নিরানন্দ-শিক্ষালাভের কঠোর জাঁতাকলের এক নির্মম চিত্র—যা তাঁর শৈশব জীবনকে করে তুলেছিল দুর্বিষহ। শৈশবের এই সংগ্রামের স্মৃতিতেই সুপ্ত ছিল রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম, বিশ্বভারতী এবং শ্রীনিকেতন ও শিক্ষাসত্রের বীজ।

"ভারতবর্ষের যে মন আজ হিন্দু বৌদ্ধ জৈন শিখ মুসলমান খৃষ্টানের মধ্যে বিভক্ত ও বিশ্লিষ্ট হইয়া আছে সে মন আপনার করিয়া কিছু গ্রহণ করিতে বা আপনার করিয়া কিছু দান করিতে পারিতেছে না। দশ আঙুলকে যুক্ত করিয়া অঞ্জলি বাঁধিতে হয় — নেবার বেলাও তাহার প্রয়োজন, দেবার বেলাও। অতএব ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থায় বৈদিক পৌরাণিক বৌদ্ধ জৈন মুসলমান প্রভৃতি সমস্ত চিত্তকে সম্মিলিত ও চিত্তসম্পদকে সংগৃহীত করিতে হইবে; এই নানাধারা দিয়া ভারতবর্ষের মন কেমন করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে তাহা জানিতে হইবে।"

শিক্ষার প্রকৃত ক্ষেত্র এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কাজ কী সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের ছিল স্পষ্ট ধারণা ও বক্তব্য, যা তিনি বিভিন্ন ভাবে বলার চেষ্টা করেছেন। "... শিক্ষার প্রকৃত ক্ষেত্র সেইখানেই যেখানে বিদ্যার উদ্ভাবনা চলিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য কাজ বিদ্যার উৎপাদন, তাহার গৌণকাজ সেই বিদ্যাকে দান করা। বিদ্যার ক্ষেত্রে সেই সকল মনীষীদিগকে আহ্বান করিতে হইবে যাঁহারা নিজের শক্তি ও সাধনাদ্বারা অনুসন্ধান আবিষ্কার ও সৃষ্টির কার্যে নিবিষ্ট আছেন। তাঁহারা যেখানেই নিজের কাজে একত্র মিলিত হইবেন সেইখানে স্বভাবতই জ্ঞানের উৎস উৎসারিত হইবে, সেই উৎসধারার নির্ঝরিণী তটেই দেশের সত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইবে। বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের নকল করিয়া হইবে না।"

ভারতের প্রকৃত শিক্ষার রূপ কেমন হবে সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাভাবনা ছিল সুদূরপ্রসারী। তাই তিনি বলেছেন, ".... সেই শিক্ষাই আমাদের দেশের পক্ষে সত্য শিক্ষা যাহাতে করিয়া আমাদের দেশের নিজের মনটিতে সত্য আহরণ করিতে এবং সত্যকে নিজের শক্তির দ্বারা প্রকাশ করিতে সক্ষম করে। পুনরাবৃত্তি করিবার শিক্ষা মনের শিক্ষা নহে, তাহা কলের দ্বারাও ঘটিতে পারে।... সকল দেশেই শিক্ষার সঙ্গে দেশের সর্বাঙ্গীণ জীবনযাত্রার যোগ আছে।... ভারতবর্ষে যদি সত্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তবে গোড়া হইতেই সে বিদ্যালয় তাহার অর্থশাস্ত্র, তাহার কৃষিতত্ত্ব, তাহার স্বাস্থ্যবিদ্যা, তাহার সমস্ত ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে আপন প্রতিষ্ঠাস্থানের চতুর্দিকবর্তী পল্লীর মধ্যে প্রয়োগ করিয়া দেশের জীবনযাত্রার কেন্দ্রস্থান অধিকার করিবে। এই বিদ্যালয় উৎকৃষ্ট আদর্শে চাষ করিবে, গোপালন করিবে, কাপড় বুনিবে এবং নিজের আর্থিক সম্বল লাভের জন্য সমবায় প্রণালী অবলম্বন করিয়া ছাত্র-শিক্ষক ও চারদিকের অধিবাসীদের সঙ্গে জীবিকার যোগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইবে। এইরূপ আদর্শ বিদ্যালয়কে আমি বিশ্বভারতী নাম দিবার প্রস্তাব করিয়াছি।"

তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষার এই আদর্শকে ব্যবহারিক রূপ প্রদানের জন্য বেছে নিলেন সুরুল 'কুঠিবাড়ি'কে। প্রতিষ্ঠা করলেন শ্রীনিকেতন (১৯২২) এবং শিক্ষাসত্র (১৯২৪)

স্কুল। ওখান থেকেই শুরু হল পল্লী-সংগঠনের কাজ, পার্শ্ববর্তী গ্রামবাসীদের দুঃখ, দুর্দশা ও অশিক্ষার অন্ধকার থেকে মুক্ত করার ঐকান্তিক ইচ্ছা নিয়ে।

১৯২৪ সালে শান্তিনিকেতনে ছ-টি ছেলেকে নিয়ে সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হল শিক্ষাসত্র। একদিকে কুঞ্জলাল ঘোষের নেতৃত্বে গ'ড়ে উঠতে থাকে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয়, অপরদিকে সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের ঐকান্তিক চেষ্টায় গোড়াপত্তন হয় শিক্ষাসত্রের। ১৯২৬ সালে সন্তোষচন্দ্রের মৃত্যু হয়। তার পরের বছরই অর্থাৎ ১৯২৭-এ শিক্ষাসত্রের স্থানান্তর হয় শ্রীনিকেতনের আমবাগান অঞ্চলে। পল্লীভাবনা ও পল্লী উন্নয়নে গ্রামের ছেলেদের একটি পূর্ণ-শিক্ষা-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবে তারই সচেতনতার শিক্ষার উদ্দেশ্যে এই শিক্ষাসত্র। এই দুই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। তবে মিল যা ছিল তা হ'ল একটি পূর্ণ মানুষ হওয়ার শিক্ষা দেওয়া।

"শিক্ষাসত্রে গ্রামের ছেলেদের জন্যে শিক্ষার রুটিন্ শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়ের ছেলেদের রুটিনের মত হবে না। এগ্‌জামিনেশনের জন্যে পড়াবার দরকার নেই। তাদের দিতে হবে হাতে-কলমে পূর্ণ শিক্ষা।" শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষাসত্রের ছেলেরা স্বাবলম্বী হবে এবং শিক্ষাসত্রে শিক্ষা পাবার পর ছাত্রেরা ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিজেরাই স্থির করে নেবে তাই ছিল রবীন্দ্রনাথের মূল লক্ষ্য। এবং তা নিয়েই গড়ে উঠল শিক্ষাসত্র। শ্রীনিকেতনের পল্লী সংগঠনের কর্মকাণ্ড মিশে গেল শিক্ষাসত্রের চিন্তা-ভাবনা। কিছুদিন চলল। বর্তমানে শিক্ষাসত্র ও শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে (পাঠভবন) বিশ্বভারতীর — "রাজার" দুয়োরাণী আর সুয়োরাণী। অনেকেই তা মনে করছেন। কোন আদর্শ কোথায় রক্ষিত হবে, কী ভাবেই বা তা হবে এবং কেই বা করবেন সেটাই এখন বড়ো প্রশ্ন।

রবীন্দ্রনাথের পল্লী উন্নয়নের ভাবনা-চিন্তার এই ব্যবহারিক রূপটা সেকালের গ্রামবাসীদের দেখিয়েছিল এক নূতন আলো এবং নূতন পথের নিশানা। রবীন্দ্রনাথের এই ভাবনা-চিন্তা ও আদর্শে মুগ্ধ হয়ে শ্রীনিকেতনের কর্মযজ্ঞে যোগ দিলেন আমেরিকা থেকে আসা লেনার্ড নাইট এলমহার্স্ট (১৮৯৩-১৯৭৪) ১৯২২ সালে। তিনিই শ্রীনিকেতনের প্রথম ডিরেক্টর। ১৯২০ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন আমেরিকা ভ্রমণ করেন, তখন এই যুবকের সঙ্গে কথা বলে রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পারলেন যে এই যুবকই শ্রীনিকেতনের পল্লী উন্নয়নের কাজের সঠিক ব্যক্তি। তিনি যোগ দেন শ্রীনিকেতনে। একজন বিদেশী হয়ে রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নকে প্রাণ দিয়ে তাঁর পরিকল্পিত গ্রামোন্নয়নে কাজে নিজেকে সঁপে দিলেন একনিষ্ঠভাবে।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা এবং বিশ্বভ্রাতৃত্বের আদর্শে মুগ্ধ হয়ে লণ্ডন মিশনারি কলেজের উদ্ভিদ বিজ্ঞানের অধ্যাপক উইলিয়ম উইন্‌স্ট্যান্‌লি পিয়ার্সন (১৮৮১-১৯২৩) এলেন শান্তিনিকেতনে (১৯১৪)। ১৯১৪ সালে ঐ একই বৎসরে চার্লস ফ্রিয়ার এন্ডরুজ (১৮৭১-১৯৪০) যোগ দেন শান্তিনিকেতন আশ্রমবিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথের একনিষ্ঠ ভক্ত ও সমাজসেবী হিসাবে শান্তিনিকেতনে তিনি সূচনা করেন এক নূতন অধ্যায়। একজন বিদেশী বন্ধু এবং রবীন্দ্রনাথের অন্যতম প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে নিরলসভাবে সাহায্য করে গেছেন যতদিন তিনি শান্তিনিকেতনে ছিলেন। ভালোবেসেছিলেন রবীন্দ্রনাথের আশ্রমবিদ্যালয়কে মন-প্রাণ দিয়ে। একজন সর্বত্যাগী খ্রিস্টান সন্ন্যাসী শান্তিনিকেতনে থেকে

এভাবেই সৃষ্টি করে গেছেন ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায়। সে কালের সেই ত্যাগ, ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা যাঁকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল তিনি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠারপর (১৯২১) এই সর্বত্যাগী সমাজসেবী ভারত প্রেমী চার্লস ফ্রিয়ার এণ্ডরুজই হ'লেন বিশ্বভারতীর প্রথম উপাচার্য। পরস্পরের প্রতি কতটা শ্রদ্ধা-ভালোবাসা থাকলে এরূপ বন্ধন গ'ড়ে উঠতে পারে এটা তার একটা জ্বলন্ত উদাহরণ। এখন সেকালও নেই — সেই সব ব্যক্তিত্বও নেই। শুধু চলছে চাওয়া ও পাওয়ার হিসাব-নিকাশ। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট-বিশ্বভারতী থাকল কী গেল তা একালের কর্তাব্যক্তিদের কিছু যায় আসেনা। সপরিবারে পারিষদবর্গ নিয়ে বিদেশ ভ্রমণ, উপহার প্রাপ্তি ও জীবনপঞ্জীতে কিছু তথ্য জুড়ে দেওয়াই এদের প্রধান লক্ষ্য।

বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা হবার পর বিশ্বভারতীর কয়েকজন নূতন ছাত্র রবীন্দ্রনাথের কাছে বিশ্বভারতীর আদর্শ সম্বন্ধে কিছু জানতে চাইলে তিনি বলেছিলেন :

"আমি চাই, তোমরা বিশ্বভারতীর নূতন ছাত্রেরা খুব উৎসাহ ও আনন্দের সঙ্গে এখানকার আদর্শকে সমর্থন ক'রে কাজ ক'রে যাবে, যাতে আমি তোমাদের সহযোগিতা লাভ করি। আমার অনুরোধ যে, তোমরা এখানকার তপস্যাকে শ্রদ্ধা করে চলবে, যাতে এই প্রাণ-দিয়ে গ'ড়ে তোলা প্রতিষ্ঠানটি অশ্রদ্ধার আঘাতে ভেঙে না পড়ে।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সত্তর বৎসরের আশ্রম জীবনের অভিজ্ঞতায় একদিকে যেমন পেয়েছেন অবিমিশ্রিত শ্রদ্ধা, অবিচলিত প্রীতি, আনন্দ ও দুর্লভ ভালোবাসা; তেমনই আশ্রম বিদ্যালয়ের প্রারম্ভিক সংকল্প থেকে পেয়ে এসেছেন নিদারুণ দুঃখ, প্রিয় বিচ্ছেদের ব্যথা বেদনা, নিষ্ঠুর বিরুদ্ধতা ও অযাচিত আনুকূল্য যা তাঁর লেখনীতে অলংকৃত হয়ে রয়েছে স্পষ্টভাবে বিভিন্ন রূপে — কখনো কবিতায়, কখনো গানে কখনো বিভিন্ন চিঠি পত্রে এবং কখনো বা উপাসনা মন্দিরের বিভিন্ন সময়কার ভাষণে ও উপদেশে। "... কালের ধর্ম কাজ করছে; এসেছে কত পরিবর্তন, কত নতুন আশা ও ব্যর্থতা, কত সুহৃদের অভাবনীয় আত্মনিবেদন, কত অজানা লোকের অহেতুক শত্রুতা, কত মিথ্যানিন্দা ও প্রশংসা, কত দুঃসাধ্য সমস্যা — আর্থিক ও পারমার্থিক। পারিতোষিক পাই বা না পাই, নিজের ক্ষতি করেছি সাধ্যের শেষ সীমা পর্যন্ত — অবশেষে ক্লান্ত দেহ ও জীর্ণ স্বাস্থ্য নিয়ে আমারও বিদায় নেবার দিন এল — প্রণাম ক'রে যাই তাঁকে যিনি সুদীর্ঘ কঠোর দুর্গম পথে আমাকে এতকাল চালনা করে নিয়ে এসেছেন। এই এতকালের সাধনার বিফলতা প্রকাশ পায় বাইরে, এর সার্থকতার সম্পূর্ণ প্রমাণ থেকে যায় অলিখিত ইতিহাসের অদৃশ্য অক্ষরে।"

এ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে যে সব পত্রালাপ হয়েছিল তার দু-একটা তুলে ধরলেই বোঝা যায় এই দুই মহাপুরুষের মধ্যে কী গভীর সম্বন্ধ ছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই বিশ্বভারতী গড়ে তুলতে গিয়ে বারবার যে সব বাধার সম্মুখীন হয়েছেন তারই কিছুটা লাঘব করার চেষ্টা করেছেন মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে পত্রালাপের মাধ্যমে। বিশ্বভারতী তখন এক চরম আর্থিক সংকটের মুখোমুখি। বিশ্বভারতীর কী হবে এবং কীভাবেই বা চলবে তারই নিরন্তর চিন্তায় তিনি ছিলেন বিভোর। গান্ধী বেশ কয়েকবার শান্তিনিকেতনে আসেন

রবীন্দ্রনাথের কর্মকান্ড দেখার সুযোগ নিয়ে। তার মধ্যে ১৯১৫, ১৯২০, ১৯২৫, ১৯৪০ এবং শেষে ১৯৪৫ সনগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একজন গুরুদেব আর একজন মহাত্মা। তাই তাঁর মনোবেদনা ও চিন্তার কথা গান্ধীকে লেখা ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫-এ এক আবেদনে তা ব্যক্ত করেন। সেই আবেদনটি হল —

Santiniketan, (Birbhum)
12th September 1935

My dear Mahatmaji,

I am glad Suren had an opportunity to discuss with you in detail the financial situation of the *asrama* during his recent visit to Wardha. I know how busy you are with your various activities and though I have often thought of telling you of my difficulties I have never done so before. But Charlie insisted that you must be informed about the situation and then only I gave permission to discuss it with you. Over thirty years I have practically given my all to this mission of my life and so long as I was comparatively young and active I faced all my difficulities unaided and through my struggles the institution grew up in its manifold aspects. And now, however, when I am 75 I feel the burden of my responsibility growing too heavy for me, that owing to some deficiency in me that my appeals fail to find adequate response in the heart of my people though the cause that I have done my utmost to serve is certainly valuable. Constant begging excursions with absurdly meagre results added to the strain of my daily anxieties and have brought my physical constitution nearly to an extreme verge of exhaustion. Now I know of none else but yourself whose words may help my countrymen to realise that it is worth their while to maintain this institution in fullness of its functions and to relieve me of perpetual worry at this last period of my waning life and health.

With deepest love,

Rabindranath Tagore

এই চিঠির উত্তরে গান্ধী লিখলেন —

Wrdha,
13 October 1935

Dear Gurudev,

Your touching letter was received only on 11th inst. when I was in the midst of meetings. In the hope of delivering it to me personally Anil needlessly detained it. I hope he is now quite restored to health. Yes, I have the financial position before me now. You may depend upon my